মোঃ আবদুল কাদের
গোলাম নবী জুয়েল

পুরোগামী প্রাচ্যে স্থবির বাংলাদেশ

প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা বদলে যাচ্ছে। প্রাচ্যের ললাট থেকে বর্তমানে 'দরিদ্র' শব্দটি ক্রমশঃ বিলীয়মান। এখন আর জোর গলায় কোন পশ্চিমা বলতে পারবে না প্রাচ্য দরিদ্র। কোন অর্থেই প্রাচ্য আর দরিদ্র নেই। শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বাণিজ্য এবং অর্থনীতি–জীবনের যে দিকেই দৃষ্টি ফেরানো যাক না কেন সর্বত্রই প্রাচ্যের এখন জয় জয়কার। উন্নতির এই ধারাটি সূচিত হয়েছে আড়াই দশক আগে প্রযুক্তিকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে। মেধা আর মননে প্রাচ্যের সুনাম সুপ্রাচীন। তার সাথে যোগ হয়েছিল বৈষয়িক ধ্যান-ধারণা। ব্যাস, তাতেই শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি। জাপান তো আগে থেকেই পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার মাথা ব্যথার কারণ ছিল, তা আরো প্রকট হলো। খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নতুন নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং ভারত। এদের পদাংক অনুসরণ করে কম-বেশি ধাবমান শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইন।

প্রশ্ন হলো কি চায় এরা? দীর্ঘ দিন ধরে রুটি-রুজির অন্বেষণে প্রাচ্যের মেধা পশ্চিমাদের সেবা করেছে। এবার তারা স্বদেশকে পরিপুষ্ট করতে চায়। দ্বিধান্বিতদের প্রশ্ন, পারবে কি? আত্মপ্রত্যয়ীদের জবাব যারা পশ্চিমে পেরেছে তারা পুবে পারবে না কেন? পারতেই হবে। আর এই গভীর প্রত্যয় থেকে জাগছে প্রাচ্যের জনগণ। যা থেকে বাংলাদেশীদেরও শেখার আছে অনেক কিছু।

পাঠকদের ছোট্ট প্রশ্ন হতে পারে, উন্নতির হাতিয়ারগুলো কি? এক্ষেত্রে অনেক কথাই হয়তো বলার আছে। এশীয়দের উচ্চ সঞ্চয় হার, কাজের প্রতি আগ্রহ এবং আরো অনেক অনেক কিছু। কিন্তু সাফল্যের সোপানের চাবিকাঠিটি যে প্রযুক্তির ভাণ্ডারে রয়েছে তা যে কেউ স্বীকার করবেন।

ইন্দোনেশিয়ার কথাই ধরা যাক। প্রাচ্যের একটি দেশ। অত্যন্ত জনবহুল দেশ। এইতো ৩/৪ দশক আগেও দেশটির সার্বিক অবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভাল কিছু ছিল না। কিন্তু এখন? মাথাপিছু আয় ৬৭০ মার্কিন ডলার। যেখানে বাংলাদেশের মাত্র ২৩৫ ডলার। গত আড়াই দশকে ইন্দোনেশিয়ায় মাথাপিছু আয় বেড়েছে গড়ে ৪.৬ শতাংশ হারে। কিন্তু ৮০ দশকে বৃদ্ধির হার ছিল ৮–১০ শতাংশ। কারণ একটিই– প্রযুক্তির সফল ব্যবহার। আর সেই প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে কমপিউটার। একটি তথ্যই চমকে দেয়ার মত। দেশটিতে ১৯৯৪ সালে পিসি বিক্রি হয়েছে ২,৫০,০০০ ইউনিট।

রুডি রামলির কথাই ধরুন। যুক্তরাষ্ট্র ফেরত এমবিএ ডিগ্রীধারী রুডি ১৯৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালি ব্যাংকে যোগদান করেন। তখন একমাত্র তাঁর অফিস রুমেই ছিল আমেরিকা থেকে সাথে করে নিয়ে আসা একটি পিসি। তাঁর যোগ দেয়ার প্রথম ৬ বছরে বালি ব্যাংকে যে পরিবর্তন এলো তা এক কথায় বৈপ্লবিক।

এ প্রসঙ্গে ব্যাংকের একজন কর্মচারীর মন্তব্য, 'রুডি রামলি আসার আগে ব্যাংকের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সামান্য অর্থের ভাউচারেও তার বাবার সই প্রয়োজন ছিল।' উল্লেখ্য বালি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা রুডির বাবা।

রুডি কি করেছিলেন? শুরুটা করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কমপিউটারটি দিয়ে এবং পরবর্তী ৬ বছরের মধ্যে বালি ব্যাংকের ৩৫০০ কর্মীর সবার কাজকে কমপিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসেন। এখন আর ব্যাংকের শাখাগুলোতে কার্বন পেপারের ছড়াছড়ি নেই, খাতককে এসে সেবা পাবার জন্য বসে থাকতে হয় না। গ্রাহক বসিয়ে রেখে ব্যাংক অফিসারকে বিশাল সাইজের লেজার খাতা মিলাতে হয় না। এ রকম অনেক কাজের ঝামেলা কমে গেছে। এখন শুধু কমপিউটারের বোতাম টিপতে হয়। এমনকি প্রশাসনিক কর্মকান্ড তদারকীর জন্য রুডি রামলিকে নিজের অফিস রুম হতে খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হতে হয় না। সব কিছুই হচ্ছে কমপিউটারে। বালি ব্যাংকে প্রতি ৬ জন স্টাফের জন্য রয়েছে একটি কমপিউটার। কমপিউটার ব্যাংকের অফিসারদের কর্মক্লান্তি দূর করেছে, তাঁদের ভার কমিয়েছে, কাজে এনেছে আনন্দ, গ্রাহক সেবা করেছে উন্নততর, সেবার গতি হয়েছে দ্রুততর। সর্বোপরি ব্যাংকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বহুগুণ বেড়েছে এবং বাড়ছে।

রামলি একা নয়, এমন আরো অনেক উদ্যমী ও সৃষ্টিশীল তরুণ এশিয়াকে বিশ্বের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে কমপিউটারের নানামুখী প্রয়োগ নিয়ে স্ব স্ব দেশে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিশ্ব ইতিহাসকে নিজেদের পক্ষে লেখার জন্য এরা যেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। জাপান থেকে উত্থিত ঢেউ ভারত-পাকিস্তান পর্যন্ত আঘাত হেনেছে।

ভারতে সনাতন পদ্ধতিতে কমপিউটার বহন করা হচ্ছে

সূর্যোদয়ের দেশের সোনালী আভায় সোনার বাংলার সন্তানেরা এবার নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে কমপিউটার নিয়ে মেতে উঠতে চায়। কিন্তু আশা জাগানিয়া নেতৃত্বের শূন্যতায় ভুগছে এদেশ। কমপিউটার তৈরির কোন শিল্প-কারখানা না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান ও মেধা বাড়ানোর এই উপকরণের উপর ভ্যাট-ট্যাক্স বসানোর নজির প্রাচ্যে কেবল এ একটি দেশেই পাওয়া যায়। মাত্র ১২ কোটি টাকা ট্যাক্সের জন্য ১২ কোটি লোকের দেশ ও জাতির মেধা-মননের হাতিয়ারকে ধ্বংস করছে অযোগ্য ও প্রযুক্তিতে উদাসীন নেতা-নেত্রী ও কর্তারা। তিন বছর পর একটি পিসি প্রায় obsolete বা বাতিল হয়ে যায়, অথচ এখানে একটি পিসির অবচয় হার টাইপ রাইটার বা ফার্নিচারের সমান ধরা হয়। ফলে এর ব্যবহার হচ্ছে নিরুৎসাহিত।

এখানে দূরদৃষ্টির অনুপস্থিতি বড়ই প্রকট। সামান্য একটা সিদ্ধান্ত দিতে পর্যন্ত পারছে না আমাদের ঋণ করে ঘি খাওয়ায় অভ্যস্ত নীতি নির্ধারকগণ। ই-মেইল, ইন্টারনেট চালু করা যাবে কিনা তার জরুরী ফাইল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এসে এখানে আমলাদের কাছে এসে পড়ে থাকে বছরের পর বছর। মেধাবী বাংলাদেশীদের হাতে কমপিউটার তুলে দিতে এর দাম কমাতে পারছেন না তাঁরা। একটি অতি প্রয়োজনীয় (কোথাও কোথাও যা ইতিমধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে) বস্তুকে বিলাসী পণ্যের মত উচ্চ রাজস্বের ভারে ভারাক্রান্ত করে রাখা হয়েছে। অথচ মোটা বুদ্ধিতে টিভি বা ফোর হুইল ড্রাইভ বিলাসবহুল গাড়ীর উপর ট্যাক্স বছরে বছরে কমিয়েই চলেছেন। এর চূড়ান্ত ফল যেটি হতে পারে তা হলো তথ্য যুগের একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ হবে লণ্ঠনবাহী রানার। প্রাচ্যের দেশগুলো যখন তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও তার সুফল নিয়ে এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরি করে উন্নতির পতাকা ধরে বীরদর্পে অগ্রসরমান, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার নিয়ে এই অভাগা দেশ তখন স্থবির। ঝুলিতে ভ্যাট ও ট্যাক্সের টাকা নিয়ে বিশ্বের দশটি সেরা দালানের একটিতে বসে দরিদ্র এ দেশটির অর্বাচীন নেতৃত্ব পাজারো কালচারে ব্যস্ত।

উন্নতিতে গতিময়তা আনতে এশিয়ার সরকারগণ কি করছেন তা আমাদের দৃষ্টি মেলে দেখা দরকার। পরিসংখ্যানে দেখা যায় গত দু'বছরে এশিয়ার অধিকাংশ দেশের সরকার তাদের কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে কমপিউটারের প্রয়োগ বাড়িয়েছেন এবং তাদের অনুসৃত নীতির কারণে বেসরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং বাসাবাড়ীতে পর্যন্ত কমপিউটারের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯৯৪ সালে এই বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি। ১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোতে মোট পিসি বিক্রি হয়েছে ৭৯ লাখ ইউনিট। ১৯৯৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে এক কোটিরও বেশি। ভিয়েতনামের মত দেশেও গত বছর পিসি বিক্রি হয়েছে ৪০,০০০ ইউনিট। বাংলাদেশে এপর্যন্ত বিক্রিত পিসির সংখ্যা ২৫,০০০-এর উর্ধে নয়। বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে ২০০০ সাল পর্যন্ত এশিয়ার বাজারে পিসি বিক্রি প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের এক তৃতীয়াংশ হারে বাড়বে। কারো কারো মতে বৃদ্ধির হার উত্তর আমেরিকার দ্বিগুণেরও বেশি হবে। এর ভোক্তা হবে কোন দেশগুলো সে প্রসঙ্গে ধারণা পেতে

বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পো. ১৯৯৪ সালের তথ্য উপস্থাপন করেছে। এতে দেখা যায় জাপানে বিক্রি হয়েছে সর্বাধিক প্রায় ৩২ লাখ ইউনিট। এরপর রয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, হংকং থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ। এই তালিকায় বাংলাদেশের স্থান নেই কারণ মিলিয়ন বা লাখের ইউনিট হিসেবে উপস্থাপিত তালিকায় স্থান পাওয়ার মত সংখ্যা পিসি এখনো এদেশে বিক্রি হয় না। বর্তমান নীতিমালার আওতায় সেটি হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

তবে এশিয়ার ক্রমবর্ধিষ্ণু বাজার কমপিউটার ব্যবসায়ীদেরও মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। বাজার দখলের লক্ষ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে আমেরিকা, জাপান ও তাইওয়ানের কমপিউটার প্রস্তুতকারীগণ। এর সুফল ভোগ করছে নিঃসন্দেহে ভোক্তারা। তারা প্রতিযোগিতামূলক কম দামে ভাল পণ্যটি পাচ্ছেন।

লাভ কম হলেও প্রস্তুতকারীরা সন্তুষ্ট। কারণ, তাদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। আইবিএম এবং এসার উভয়েই দাবী করছে তাদের উৎপাদিত মোট পিসির ২০-২৫ শতাংশের ক্রেতা হলো এশিয়ার সরকার ও জনগণ। আগেই বলা হয়েছে এখনো জাপান এশিয়ার সর্বাধিক কমপিউটার ভোক্তা রাষ্ট্র। তবে বিপুল জনগোষ্ঠীর চীন যেভাবে তাদের উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে কমপিউটারকে দ্রুত গতিতে গ্রহণ করছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে যদি জাপানের শীর্ষস্থানটি তারা দখল করে তবে অবাক হবার কিছু থাকবে না। ১৯৯৩ সালে চীনে পিসি বিক্রি হয়েছিল ৪,৫০,০০০ ইউনিট। ১৯৯৪ সালে বিক্রি হয়েছে ৬,৫০,০০০ ইউনিট। চীন এখন বিপুল সংখ্যক বিশ্বমানের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছে। দেশটিতে এখন প্রতি বছর ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) করে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রী লাভ করছে।

ভারতও বসে নেই। দেশটিতে কমপিউটারায়নের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার চালুর এক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে। ৬,৭০,০০০ পিসির দেশ ভারতে এখন বছরে ১,০৭০ কোটি রুপীর ২,৪৫,০০০ ইউনিট পিসি বিক্রি হচ্ছে যা আগামী কয়েক বছরে কয়েকগুণ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একথা সকলেই জানেন যে, বিশ্বের কমপিউটার-সফটওয়্যার অঙ্গনে ভারতীয় প্রোগ্রামারদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং বর্তমানে প্রচলিত অনেকগুলো জনপ্রিয় প্রোগ্রাম ভারতীয় প্রোগ্রামারদের অনন্য সৃষ্টি।

ভারতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে সফটওয়্যার বাজার ছিল ৮৫ কোটি ডলার। গত পাঁচ বছর ধরে এ সংখ্যা বছরে ৫৪% বাড়ছে। বিভিন্ন সংস্থায় নিজেদের ব্যবহারের জন্য ইন-হাউজ যে সফটওয়্যার তৈরি করে এর সাথে তা যোগ করলে এর মুল্য দাঁড়ায় ১২০ কোটি ডলার। নাশকমের এক দ্বীপ অনুযায়ী ২০০০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০ কোটি ডলার।

এই স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে ভারত সরকার সে দেশে সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য যা যা করণীয় তার সবই করছেন। বর্তমানে সে দেশে ৫০,০০০-১,০০,০০০ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। তারা আগামী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে এই সংখ্যাকে বাড়িয়ে ৫ লাখ থেকে ১০ লাখে উন্নীত করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পাশাপাশি সে দেশের কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোও দক্ষ জনবল তৈরি করতে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে ব্যাপক হারে। এন আই আই টি এবং এপটেক নামক কেবলমাত্র দুটি প্রতিষ্ঠানই এখাতে অক্টোবর '৯৩-সেপ্টেম্বর '৯৪ পর্যন্ত আয় করেছে যথাক্রমে ৯৬.৮ কোটি এবং ৮৩.৫ কোটি রুপী। এরা আইএসও মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ভারতে এ ধরনের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা কমপক্ষে ২০টি। জিটিভি একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে দেশে ৫ কোটি লোককে টিভির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে কমপিউটারে দক্ষ করে গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে প্রত্যেক সাংসদ কনটিনজেন্সী ফান্ড থেকে তাঁর এলাকায় অন্তত ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ও মডেম দিচ্ছে ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় ভারতে নইদা, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, পুণা, গান্ধীনগর, ভূবেনশ্বরসহ আরো অনেক স্থানে রয়েছে সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক। এখানে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু শুল্কমুক্ত আমদানী সুবিধা দেয়া হয়, সাথে রয়েছে হাইস্পীড ডাটা কমিউনিকেশন এবং লাল ফিতার দৌরাত্নশূন্য ব্যবস্থা আর সফটওয়্যার রপ্তানী আয়ের ১০০% আয়করমুক্ত রাখার সুবিধা।

দেশটি কেবল প্রয়াত রাজীব গান্ধীর মত বৈজ্ঞানিক দূর দৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক মননশীল নেতৃত্ব পায়নি, সেখানে কপিল দেবের মত বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে দেশের শিক্ষার্থীদের কমপিউটার শেখার উৎসাহ দান করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে একটি সাধারণ কমপিউটার ভীতি হলো এর জনপ্রিয়তায় কর্মীরা কাজ হারাবে। কিন্তু যে যে সেক্টরে এর ব্যবহার বেড়েছে দেখা গেছে সেখানে কর্মী ছাটাই হয়নি বরং প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফল কর্মীরাও পেয়েছে। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে জাপানে পর্যন্ত কমপিউটারের প্রবেশ শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যা ঐ শিল্পোন্নত দেশটিকে পর্যন্ত কমপিউটারায়নে বাঁধা দিয়েছে।

ভিয়েতনামে এখন হাতে টানা গাড়ীতে কমপিউটার বহন করার এ রকম দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে।

এশিয়ার বাজারে পিসির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি আনার লক্ষ্যে নয় বরং পিসির সর্বোচ্চ ব্যবহার তারা নিশ্চিত করতে চাচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রমে কমপিউটারের উপকারী ব্যবহারের সংবাদটি এশিয়ানদের যেমন জানা তেমনি তারা এও জানে কমপিউটার এক অনবদ্য বিনোদন মাধ্যম। তদুপরি এটি ভবিষ্যত আয়ের হাতিয়ার এবং আগামী শতাব্দীর বাহন। একের মধ্যে যার এতগুণ তাকে কে না পেতে চায়। তাই তাইপের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র পিয়াও তাইজে যেমন ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ-এর প্রতিবেদককে বলে "বড় হয়ে আমি কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার হবো"। তেমনিগ্রামীণ কমপিউটার মেলায় বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁয়ের খালি পায়ের স্কুল ছাত্রটিও কমপিউটার ছুয়ে ভেজাচোখে বলে, "বড় হলে আমি কমপিউটারবিদ্ হবো"। বুদ্ধিমান এশিয়ানরা কমপিউটারকে একান্ত নিজের করে পেতে চায়।

তেমন করে তারা যেন পেতে পারে, সে ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে তৎপর রয়েছে কমপিউটার ব্যবসায়ীগণ। এশিয়ার প্রধান প্রধান ভাষায় লেখা হচ্ছে সফটওয়্যার, পরিচিত সংস্কৃতির আবহে লেখা হচ্ছে বিনোদন ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম। মোট কথা কমপিউটার এশিয়ার দেশে দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রয়োজন পূরণ করছে অভাবিতভাবে। এখানেই কমপিউটারের বৈশিষ্ট্য, এর জনপ্রিয়তার রহস্য লুকায়িত।

কমপিউটারের সুফল যাতে সমাজ জীবনের গভীরে পৌঁছতে পারে তা নিশ্চিত করতে এশিয়ার অনেক দেশে নানামুখি তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সচেতন জনগোষ্ঠী মনে করে পশ্চিমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কমপিউটারের ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। যে কারণে কোরিয়ান বিমান সংস্থার প্রধান কমপিউটারে কাজ করা অবস্থায় ছবির পোজ দিয়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁরা অমন কমপিউটার সংস্কৃতির বিরোধী যে সংস্কৃতিতে অফিসের বসরা সৌখিন হিসেবে টেবিলে কমপিউটার রাখেন। তাই শুধু কমপিউটার কিনলেই হবে না, কেনার আগে জানতে হবে কোন কমপিউটারটি এবং কি ধরনের সফটওয়্যার ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন অতঃপর ক্রয়ের পর সেটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সর্বশেষ মডেলের নামী কোম্পানীর দামী জিনিসটি কিনতে হবে এটি একটি ভুল ধারণা। আর এই ভুল ধারণার কারণে অনেকের শেষ পর্যন্ত কমপিউটার আর কেনা হয়ে ওঠে না অথচ তার আগ্রহ আছে এবং কমপিউটারটি থাকলে অবস্থা আরো ভাল হতে পারত।

অমন সিদ্ধান্তহীনতায় সবচেয়ে কম ভোগে তাইওয়ানের জনগণ। যেখানে লক্ষ্য করা যায় জাপানে পর্যন্ত আমেরিকান কোম্পানী (এপল, আইবিএম, কম্প্যাক, ডিজিটাল প্রভৃতি)-র চাহিদা সে তুলনায় তাইওয়ানে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং তাইওয়ানের অর্থনীতির মেরুদন্ড ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে দেদারসে।

একথা ভুলে গেলে চলবে না, এশিয়ায়

প্রস্তুতকৃত কমপিউটার পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এমনকি আমেরিকায় পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। তাইওয়ানের কথাই ধরুন। দেশটি গত বছর ১১৫৮ কোটি ডলার মূল্য মানের তথ্য প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদন করেছে। ৩০,৯০,০০০ ইউনিট ডেস্কটপ পিসি এবং ২০,৫৭,০০০ ইউনিট পোর্টেবল উৎপাদন করে দেশটি নিজের চাহিদা পুরণ করে বিশ্ব-বাজারে এক উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে। বিশ্ব-বাজারে ৫২% কি-বোর্ড, ৮০% মাউস, ৫৬% মনিটর এবং ৬১% স্ক্যানার এখন তাইওয়ানে তৈরি হচ্ছে। অন্যান্য সামগ্রীর অংশও বিরাট। এখন নিজেদের প্রয়োজনে এশিয়ানরা যদি নিজেদের পণ্য ব্যবহার করে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে আমেরিকার বাঘা বাঘা কমপিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এশিয়ার বিশাল বাজার সামনে রেখে হাত পা গুটিয়ে বসে যে থাকবে না তা ইতিমধ্যে বোঝা গেছে। তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে মুনাফার পরিমাণ কমে গেলেও ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে এশীয় ও আমেরিকান কোম্পানীগুলোর মধ্যে পারস্পারিক দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। এর ফলে এপল, আইবিএম, কম্প্যাকের মতো কোম্পানীগুলো পর্যন্ত কোন নতুন মডেল বাজারে ছাড়ার মুহূর্তে এশিয়ার জন্য আলাদা দাম নির্ধারণ করতে পারছে না। লস এঞ্জেলেসে যে দাম ঐ দামেই হংকংয়ে আমেরিকান ব্রান্ড নামের নতুন মডেলটি পাওয়া যাচ্ছে।

পিসি নিয়ে এখন ব্যাপক উপস্থিতি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র সূত্র হিসেবে সকল কমপিউটার প্রস্তুতকারীর নিকট আদৃত হচ্ছে। তাই সকলে পিসি প্রস্তুতিতে জোর দিচ্ছে। কারণ কমপিউটারের এই ধরনটির ব্যবহারই বাড়ছে ব্যাপক হারে। ব্যক্তিগত পর্যায়েই বলি আর সমষ্টিগতভাবে নেটওয়ার্কিংয়ে ব্যবহারের কথাই বলি এখন পারসোনাল কমপিউটারের জয় জয়কার। যে কারণে ডিজিটাল ও হিউলেট প্যাকার্ড এখন হোম পিসি প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেছে, একটা সময় পর্যন্ত এরা শুধুই মাইক্রো কমপিউটার প্রস্তুত করতো।

এশিয়ার সম্ভাবনাময় বাজারের দিকে দৃষ্টি এখন অনেকেরই। বিশ্বের চতুর্থ ও অষ্টম বৃহত্তম কমপিউটার প্রতিষ্ঠান প্যাকার্ড বেল এবং ডেল এশিয়ায় তাদের পরিবেশক নিয়োগ করছে। একদার ক্লোন প্রস্তুতকারী বিশ্বের এক নম্বর প্রতিষ্ঠান কম্প্যাক তো আগে থেকেই আছে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে কম্প্যাকসহ বিদেশী যে কোন কমপিউটার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ একটু কষ্টকর হচ্ছে।

এশিয়ার দুই প্রধান এসার ও এএসটিও বসে নেই। এসার ইতিমধ্যেই বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম কমপিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের আসন দখল করেছে। এশিয়ার ১৭ টি স্থানে তারা এসেম্বিলি করার ব্যবস্থাও চূড়ান্ত করেছে। এএসটি জোট বেঁধেছে দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসুঙয়ের সাথে। বোঝাই যাচ্ছে তীব্র প্রতিযোগিতায় আগামীতে কমপিউটারের দাম আরো কমবে।

এখন দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়ার বয়োবৃদ্ধরাও কমপিউটার হাতে তুলে নিচ্ছেন। হয়তো তারা নিজেরা তেমন ব্যবহার করেন না কিন্তু তাদের আগ্রহ ও নির্দেশে তাদের প্রভাব বলয়ে বা পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপিউটার ব্যবহৃত হয়। যেমন চীনারা জানে প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে আসীন মধ্যবয়সী বা প্রবীন ব্যক্তিটি শুধুমাত্র সাজিয়ে রাখার জন্যই নিজের টেবিলে কমপিউটার রেখেছেন কিন্তু তিনি রেখেছেন বলেই অন্যরাও ব্যবহারের জন্য কমপিউটার পাচ্ছে। এটিই জরুরি। অনেক চীনা বৃদ্ধ ইংরেজি জানে না কিন্তু তারা কখনো তরুণদের ইংরেজী শেখাকে নিরুৎসাহিত করেনি। যেটি আমরা করছি। যে কারণে দেশের প্রথম কমপিউটারায়িত লাইব্রেরী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়ার কথা হলেও এখন পর্যন্ত সেটি হয়নি, সংসদে কমপিউটারের ব্যবহার বাড়েনি। এমনকি দেশের একমাত্র জাতীয় কমপিউটার প্রতিষ্ঠান দেশের কমপিটারায়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তোষণ, পরচর্চা, পরমুখাপেক্ষিতা আর মোসাহেবী করে দিন গুজরান করছেন আমাদের আমলা ও নীতি নির্ধারকগণ। বিশ্ব দূরে থাক,আশে পাশের দেশে কি ঘটছে তা দেখেও এরা নির্বিকার। কে কি বললো তাতেও তাদের কিছু যায় আসে না। কমপিউটারের সুফল নিয়ে প্রাচ্য যখন উন্নতির পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের অবস্থা তখন এমনি স্থবির।

[লেখাটির কিছু অংশ ১৫ জুন সংখ্যা ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে প্রকাশিত 'দি ইস্ট ইজ ওয়ার্ড' প্রতিবেদনের অনুসৃতি। আগ্রহী পাঠক এই বিষয়ের উপর আরো তথ্য জানতে চাইলে জানুয়ারী '৯২ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ মোঃ আব্দুল কাদের ও নাজীমউদ্দিন মোস্তানের লেখা 'এ ব্যর্থতা সরকারের– এশীয় কমপিউটার শার্দুলদের আসরে মুষিক বাংলাদেশ' নামক প্রতিবেদনটি পড়তে পারেন।]

বাস্তবভিত্তিক সিলেবাস

(২৯নং পৃষ্ঠার পর)

এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে এতো বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষায়তনে কমপিউটার শেখার কোন আগ্রহ দেখাবে বলে মনে হয়না। বরং তারা কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে যাবে উইন্ডোজ-ওয়ার্ড-এক্সেল-ফক্সপ্রো শেখার জন্য।

প্রশ্নের মান বন্টনের ক্ষেত্রেও সাধারণ বিষয়ের চেয়ে এ সব বিষয়কে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই পত্রে নম্বর তোলা কঠিন হয়ে পড়বে। যেহেতু বিষয়টি ঐচ্ছিক সেহেতু ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক নম্বর পাবার আশায় এ ধরনের বিষয় পড়ে থাকে। কিন্তু কঠিনতম অংক ও প্রোগ্রামিং বিষয়াদি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিষয়ের প্রতি ঝুকবে বলে আমি মনে করি না।

আজকের দিনে কমপিউটারকে সহজ করে তোলা হচ্ছে। কমপিউটার ব্যবহার করার জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করার প্রকল্প আজ আর কেউ গ্রহণ করেনা। ফলে সাধারণভাবে কমপিউটার চালাতে জানাই আজকের দিনের বিশেষ কৃতিত্ব। সিলেবাসে ২০ বছর আগে কমপিউটার বিষয়টিকে যেভাবে দেখা হতো এখনো সেভাবেই দেখা হচ্ছে। একটি জরুরী বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। সিলেবাস প্রণেতারা মনে করছেন প্রোগ্রামিং না জানলে কমপিউটার জানা হলো না। আমি মনে করি প্রোগ্রামিং বা উচ্চ স্তরের ভাষা এবং বাইনারি অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে যারা অনার্স লেভেলে অধ্যয়ন করবেন তাদের জন্য রেখে দেয়া উচিত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কমপিউটার শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকে অপশনাল বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করার পর সবাই কমপিউটার বিষয়ে অনার্স পড়বেন বা পড়তে পারবেন, এমন আশা করা বোধহয় ঠিক হবে না। এই স্তরে কম্পিউটারের মৌলিক বিষয়াদি ও প্যাকেজ প্রোগ্রামের উপর গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। কঠিন বিষয়াদি থাকলে লেখাপড়ার মান বাড়ে একথা কি আজকের দিনে বিশ্বাস করা হয়?

এমতাবস্থায় কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে নতুন করে সাজানো উচিত বলে আমি মনে করছি। আমি মনে করি আমাদের উচিত হলো অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কমপিউটার বিষয়ে পড়তে আগ্রহী করে তোলা। আমাদের বিশেষজ্ঞরা যদি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের তাঁদের সম পর্যায়ের মনে করেন তবে কোমলমতি তরুণদের পালাবার পথ থাকবে না। আমি বরং সিলেবাস কমিটির সদস্যদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনাদের প্রণীত সিলেবাস ক'জন শিক্ষক পড়াতে পারবেন?

এখনি যদি এই সিলেবাসের পরিবর্তন না করা হয় এবং যদি আগামী ২/১ বছর আমাদেরকে এই সিলেবাস পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় তবে সন্তানদের জন্য আমাদের করুণা হওয়া উচিত।

কর্মমুখী শিক্ষা নয়

রিপোর্টে বলা হয়েছে সিলেবাস প্রণীত হয়েছে কর্মমুখী শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু সিলেবাস কর্মমুখী শিক্ষার কোন কিছুই নেই। সিলেবাস প্রণেতারা মনে রাখতে পারেন নি, এ দেশে কমপিউটার শিখে কোন ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া যায়। এ দেশে চাকরির বাজারে প্রথম স্থানটি ডিটিপি-র। তারা যদি নাও মানেন তবুও গত আট বছরে মেকিন্টোস ও পিসিতে কম্পিউটারের সর্বোচ্চ সংখ্যক চাকরি তৈরী হয়েছে ডিটিপিতে। এর পরের চাকরির স্থানটি হলো অফিস অটোমেশনের। অফিস অটোমেশনে যা দরকার তা হলো ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশীট, ডাটাবেস। যেহেতু উইন্ডোজ পরিবেশে উন্নততর কাজ করা যায় সেহেতু সেই পরিবেশের এ সব সফটওয়ার শেখানো অত্যন্ত জরুরী। বেসিক শিখে কোন কর্ম এদেশে জুটবে আমি তা জানিনা। পাসক্যাল শিখে কোন কর্মও এ দেশে জুটবে বলে আমি জানিনা। আর যদি জুটেও তবে যেটুকু প্রোগ্রামিং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শেখানো হবে তাতে তো কোন কাজই করা যাবেনা। বরং ডাটাবেস প্রোগ্রামিং শেখানো হলে এদেশে অতি সহজে চাকরি পাওয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব করছি।

মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকতে পারে কমপিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা, ডস ও উইন্ডোজসহ বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে ধারনা ও পরিচালনা পদ্ধতি শেখা, ফ্লোরিস ওয়ার্কস ও প্রোগ্রামিং সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।

উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম পত্রে কমপিউটার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, কমপিউটার পরিচালনা, উইন্ডোজ-৯৫, ওয়ার্ড, এক্সেল, ফক্স প্রো, ডাটাবেস প্রোগ্রামিং ও এডবি ইলাস্ট্রেটর রাখা যেতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে থাকতে পারে কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, মাল্টিমিডিয়া, ডাটা কমিউনিকেশন ও নেটওয়ার্ক, সংখ্যা পদ্ধতি, বুলিয়ান এলজাবরা ও লজিক গেটসহ কুইক বেসিক এবং হার্ডওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ মেরামতি। ❑